বর্তমান সংকট নিরসনে করণীয়?

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, **সুজন**-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

গত ১৮ আগস্ট এক সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দেন যে, নির্বাচনকালীন সরকার সম্পর্কে তিনি সংবিধান থেকে 'এক চুলও' নড়বেন না। এরপর ২ সেপ্টেম্বর তিনি আরও সুস্পষ্টভাবেবলেন—তাঁর পূর্বের ঘোষণা সত্ত্বেওসংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হবে না, বর্তমান মন্ত্রীসভা বহাল থাকবে এবং সংবিধানে নির্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ ২৭ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের মধ্যে, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নবম সংসদের শেষ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় স্পিকার নির্বাচনের তারিখ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কথারই প্রতিধ্বনি করেন। আবার এর কয়েকদিন আগে,সকল ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবসানের লক্ষ্যে, মাননীয় আইনমন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধান সংশোধন না করার ঘোষণা দেন।

প্রধান বিরোধী দল, বিএনপি, অবশ্য অনেক দিন থেকেই বলে আসছে যে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে না আনা হলে তারা নির্বাচন বর্জন করবে। প্রধানমন্ত্রীর ২ সেপ্টেম্বরের বক্তব্যের পর বিএনপি তার আগের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে। তবে অতি সম্প্রতি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব দাবি করেছেন যে, সংবিধান সংশোধন না করেও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। শোনা যায় যে, বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিএনপি শিঘ্রই তাদের নিজস্ব রূপরেখা প্রকাশ করবে।

গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে। তবে নির্বাচনই গণতন্ত্র নয় — সংশ্লিষ্ট সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না তা বহুলাংশে নির্ভর করে দুই নির্বাচনের মাঝখানে নির্বাচিত সরকার কী-করে না-করে তার ওপর। নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করলে এবং তাদের আচার-আচরণে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চারবহিঃপ্রকাশ ঘটলে এবং সকল কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় দিলেই গণতন্ত্র কায়েম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একটি সত্যিকারের ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা তো দূরের কথা স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও আমরা একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথের বাধাগুলো দুর করতে পারিনি। তাই গণতন্ত্রের নামে আমাদের দেশে আজ এক ধরনের প্রহসন চলছে।

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ব্যাপারে আমাদের দেশে এ পর্যন্ত এখনও কোনো আইন প্রণীত হয়নি। তবে একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে পুনর্গঠিত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকে সন্দিহান। নাগরিকদের একটি অংশ ছাড়াও আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশই বর্তমান কমিশনের প্রতি ইতোমধ্যে অনাস্থা প্রকাশ করেছে। এমনকি জেনারেল এরশাদও বর্তমান কমিশনের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া অনুসন্ধান কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধেও দল প্রীতির অভিযোগ ছিলো এবং কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। উপরন্তু নির্বাচন নিয়ে কমিশনের প্রস্তুতি, বিশেষত ভোটার তালিকার সঠিকতা এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে (*প্রথম আলো,* ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩)।

আমাদের নেতা-নেত্রীদের বক্তব্য ও সাম্প্রতিক ঘোষণাবলির প্রক্ষাপটেবর্তমানে আমরা কোথায় আছি— সে ব্যাপারে একটি 'স্টক টেকিং' করা আবশ্যক:

- সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।
- মেয়াদ উত্তীর্ন হবার আগে সংসদ বিলুপ্ত করার সম্ভাবনাও অতি ক্ষীণ।
- নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেক ভোটারের মনে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে।
- ২৭ অক্টোবর কিংবা তার অব্যবহিত পরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের নেই বলেই অনেকের ধারণা।
- হালনাগাদ করা ভোটার তালিকা (৯ কোটি ২১ লাখ) ও নির্বাচনী এলাকার নির্ধারিত সীমানার সঠিকতা নিয়ে অনেকে সন্দিহান।
- সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারনের সঠিকতা নিয়েও অনেকের মনে সন্দেহ কাটেনি।

এমনি প্রক্ষাপটে তিনটি সুস্পষ্ট সম্ভাবনা আমাদের সামনে:

- আওয়ামী লীগ-বিএনপির মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য ভাবে সম্পন্ন করা। তবে এর মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হবে কিনা সে ব্যাপারে অনেকেই আশাবাদী নন।
- দ্বিতীয় সম্ভাবনা হলো রাজপথে হরতাল, অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। রাজপথের আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন, এমকি তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে তা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়, যা সহিংসতার রূপ নিতে বাধ্য। রাজপথের সহিংস আন্দোলনের মুখেও ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালাবে— তাও নিশ্চিত করে বলা যায়। এ প্রচেষ্টা সফল এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নির্বাচন করা সম্ভব হলেও, সে নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি কম থাকবে এবং তা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। রাজপথের সহিংস আন্দোলন অবশ্য বেসামাল পর্যায়েওপৌঁছতে পারে, যার ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আবারও ভেঙ্গে পড়তে এবং অনির্বাচিত ব্যক্তিরা আরেকবার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। তাই রাজপথের অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণত সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না, বরং তা সমস্যাকে আরও ব্যাপক,জটিল ও ভয়াবহ করে তুলতে পারে।
- তৃতীয় সম্ভাবনা হলো সমস্যার স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের কথা ভাবা, যে সমাধান শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তাই দেবে না, বরং আমাদের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভুমিকা রাখবে। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নিয়ে আরও বৃহত্তর পরিসরে সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা এবং একটি ‘জাতীয় সনদ’ প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যেখানে আমাদের নেতা-নেত্রীরা মূলত ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যবা ক্ষমতা আকড়ে ধরে থাকতে তথা ক্ষমতার রাজনীতিতে বিভোর এবং আমরা জাতি হিসেবে নির্বাচন পাগল, সেখানে দীর্ঘমেয়াদী ভাবনার চিন্তা করাও এ মূহুর্তে অমূলক।

ক্ষমতাসীন দলের সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে প্রবল অনীহার কারণে বর্তমানে সমঝোতাকামী নাগরিক ও আমাদের উন্নয়ন সহযোগী বিদেশী বন্ধুরাএখন সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকেই একটি সমাধানে পৌঁছার। এব্যাপারে কয়েকমাস আগে টিআইবির পক্ষ থেকে‘নির্বাচনকালীন সরকারে’র (ইটিজি) একটিরূপরেখা উত্থাপন করা হয়। রূপরেখায় প্রথমেই স্পিকারের উদ্যোগে আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ও তাদের জোটের অন্যান্য দল থেকে সম-সংখ্যক সংসদ সদস্য নিয়ে চার কিংবা ছয় জনের একটি ‘পার্লামেন্টারি কনসেন্সাস কমিটি’ (পিসিসি) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। পিসিসি নির্বাচন কালীন সরকারের জন্য ১১ সদস্যের নাম প্রস্তাব করবে, যার মধ্যে একজন হবেন এর প্রধান। উভয় পক্ষ থেকে পাঁচজন করে নিয়ে অথবা অতীতের কয়েকটি নির্বাচনে ভোট প্রাপ্তির গড় হারের ভিত্তিতে বাকী দশজন মনোনয়ন পাবেন।

ইটিজিরদশ সদস্যকে তিন বিকল্প পদ্ধতিতে মনোনীত করা যেতে পারে। প্রথমত, বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে, যা টিআইবির নিজের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, সংসদ সদস্য এবং সংসদের বাইরের নির্দলীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র নির্দলীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে।

পিসিসি সংশ্লিষ্ট দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দুই বিকল্প পদ্ধতিতে ইটিজি প্রধানের নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। প্রথমত, ইটিজির জন্য নির্ধারিত দশজন ব্যক্তি নিজেরা পিসিসির সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে অথবা সংসদের বাইরের একজন সৎ, বিশ্বাসযোগ্য ও নির্দলীয় ব্যক্তিকে ইটিজি প্রধান করার সুপারিশ করবেন। দ্বিতীয়ত, পিসিসি নিজেই একজন ব্যক্তিকে ইটিজির প্রধান হিসেবে মনোনীত করবেন এবং তিনি পিসিসির পরামর্শক্রমে ইটিজির অন্যান্য সদস্যদের নাম প্রস্তাব করবেন। এভাবে প্রস্তাবিত ব্যক্তিদেরকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে নিয়োগ দান করবেন।ইটিজির মেয়াদ হবে ৯০ দিন এবং দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র রুটিন কাজ করা এবং সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।ইটিজির কোনো সদস্য দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

এর আগে ড. আকবর আলী খান নির্বাচনকালীন সরকার গঠন সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব দেন (*প্রথম আলো,* ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট থেকে গত পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে অবসরে যাওয়া বিচারপতিদের মধ্য থেকে একজনকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচনকালীন সরকার প্রধান করা যেতে পারে। অথবা ১৫-২০ জনের একটি তালিকা থেকেও একজনকে উভয় পক্ষের সম্মতিতে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য অবশ্য সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। সংবিধানের ভেতরে সমাধান চাইলে সরকারি দল থেকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া চার জন মন্ত্রী এবংবিরোধী দল থেকে পাঁচজন মন্ত্রী ঠিক করা যেতে পারে। এক পক্ষ আরেক পক্ষের মন্ত্রীদের নির্বাচন করবে।

এসব প্রস্তাবের সমস্যা হলো যে, এগুলো কাজ করতে হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের সদিচ্ছা লাগবে, যা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিশেষত সরকারি দল বিভিন্ন অজুহাতে সংলাপের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন বলেও অনেকে মনে করেন, যদিও সঙ্কট সাধানের 'বল' এখন মূলত তাদেরই কোর্টে। আর আমাদের আশঙ্কা যে, টিআইবি প্রস্তাবিত দশজন দলীয় ব্যক্তি এবং একজন নির্দলীয় প্রধানকে নিয়ে গঠিত ইটিজি সম্পূর্ণ অকার্যকর হবে বলে অনেকের ধারণা।

তবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব থাকলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যেএক ধরনের মতৈক্য বিরাজমান বলে আমাদের ধারণা। আমাদের মনে হয় নাগরিকদের অনেকেই চান যে:

- যথাসময়ে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।
- নির্বাচনকালীন সময়ে ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় সরকারগঠিত হোক, যার দায়িত্ব হবে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষ আচরণ নিশ্চিত এবং নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মত সংসদ ২৭ অক্টোবরের পূর্বেই বিলুপ্ত করা হোক। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের রায়েও নির্বাচনের ৪২ দিন আগে সংসদ বিলুপ্তি সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণরয়েছে। '*দি ঢাকা ট্রিবিউন*'কে দেওয়া এক সাম্প্রতিক (১৮ মে ২০১৩) সাক্ষাৎকারে সাবেক প্রধান বিচারপতি ও আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের প্রণেতা জনাব খায়রুল হক নির্বাচনের আগে বর্তমান সংসদ বিলুপ্তির লক্ষ্যে আরেকবার সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দেন।

- নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা হোক, যার জন্য নির্বাচনী আইনে কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক। একই সঙ্গে দলের তৃণমূলের নেতা কর্মীদের তৈরি প্যানেল থেকে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। 'না-ভোটে'র বিধানও ফিরিয়ে আনা হোক। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার জন্য 'ম্যান বিহাইন্ড দি গান'দের পরিবর্তন, অর্থাৎ বর্তমান কমিশনের পুনর্গঠনের প্রয়োজন পড়বে।
- রাজনেতিক দলগুলো আইনকানুন, বিশেষত নির্বাচনী বিধিবিধান (যেমন, দলে গণতন্ত্র চর্চা) মেনে চলুক, তারা অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরত থাকুক এবং মনোনয়ন বাণিজ্য পরিহার ও নির্বাচনকে টাকার খেলাতে পরিণত না করুক।
- সর্বোপরি, রাজনীতিবিদগন সংলাপের মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যাগুলোর সমাধান করুক, যাতে সংঘাত এড়ানো যায় এবং নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

প্রসঙ্গত, *ঢাকা ট্রিবিউন*কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিচারপতি খায়রুল হক চূড়ান্ত রায় প্রকাশের আগেই বর্তমান সরকারের সংবিধান সংশোধনের সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, সরকার ও বিরোধী দল উভয়েই তাঁর রায়ের অংশবিশেষ গ্রহণ করার কারণেই — যেমন, সরকারি দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অসাংবিধানিক এবং বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আরও দুই টার্মের জন্য রাখা যায় — বর্তমান সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর রায়ের আওতায় সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে রাখা যায় বলেও দাবি করেছেন, যদিও তিনি নিজে তা গ্রহন করবেন না। সাক্ষাৎকারে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের তাগিদ দেন।

যেহেতু সরকার এখন সংবিধান সংশোধন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই সংলাপের মাধ্যমে সমাধান বের করতে হবে। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে নির্বাচনকালীন সরকারের নির্বাচিত হবার ব্যাপারেবাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাই নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়েই নির্বাচনকালীন সরকার গঠিত হতে হবে, যদি না সরকার শেষ মূহুর্তে মত পরিবর্তন করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

বিরাজমান সংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে একটি নির্বাচিত ও কার্যকর নির্বাচনকালীন সরকার দুইভাবে গঠিত হতে পারে বলে আমরা মনে করি। এর একটি হতে পারে দলনিরপেক্ষ ১১জন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাদেরকে নির্বাচিত করে এনেনির্বাচনকালীন সরকার গঠন করা। এজন্য অবশ্য সম-সংখ্যক বর্তমান সংসদ সদস্যের পদত্যাগ করতে হবে।

নির্বাচনকালীন নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বিকল্প হতে পারে সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে পাঁচজন করে দশজন এবং নির্দলীয় ব্যক্তিদের মধ্য আরও পাঁচজনকে নিয়ে মোট ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা। এক্ষেত্রেও নির্দলীয় ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে আনতে হবে।

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: কীভাবে প্রথম বিকল্পের দশজন অথবা দ্বিতীয় বিকল্পের ১৫ জন মনোনীত হবেন? একটি অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। আমাদের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে এই অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হতে পারে এবং সবার জ্যেষ্ঠ সাবেক প্রধানবিচারপতি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অনেকেরই স্মরণ থাকতে পারে যে, বর্তমান লেখক সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সামনে এমন একটি অনুসন্ধান কমিটির প্রস্তাব করেছিলো।

পরিশেষে, এটি সুস্পষ্ট যে, জাতি হিসেবে আজ আমরা এক ক্রসরোডে অবস্থান করছি। আমাদের একদিকে রয়েছে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ এবং সবার অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক উত্তোরণ। অন্যদিকে রয়েছে একদলীয় নির্বাচন করার মাধ্যমে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আবারও খাদে ফেলে দেওয়া ব্যবস্থা। অনেকের আশঙ্কা যে, বিরোধী দলের বর্জনের মুখে এক তরফা নির্বাচনের ফলে সারাদেশে সহিংতা সৃষ্টি ছড়াবে এবং জাতি হিসেবে আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হব। এর পরিণতি হবে একটি অকার্যকর, এমনকি উগ্রবাদী রাষ্ট্র। তাই আমাদের দুই নেত্রীকে আজ ঠিক করতে হবে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের জন্য কীধরণের ‘লিগেসী’ বা উত্তরাধিকার তাঁরা রেখে যেতে চান!